Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXIII, June 2016

রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক অস্তিত্ববাদ

মো. শওকত হোসেন*

সার-সংক্ষেপ: পাশ্চাত্য দর্শনের মানবকেন্দ্রিক বা মানবতাবাদী দর্শনের মধ্যে অস্তিত্ববাদ অত্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি দার্শনিক মতবাদ। হেগেলোত্তর যুগের অন্যান্য অনেক দার্শনিক আন্দোলনের মতো এই মতবাদটি কোন সুগঠিত দার্শনিক আন্দোলন নয়। তথাপিও অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মূল মতাদর্শের ক্ষেত্রে প্রায় সকলের মধ্যেই ঐক্যমত্য আছে। এ সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই কাউকে অস্তিত্ববাদী বলা যায়। পাশ্চাত্যের অনেক চিন্তাবিদ আছেন যারা অস্তিত্ববাদী বলে নিজেকে পরিচয় না দিলেও এমনকি অস্তিত্ববাদ শব্দটি একটি দার্শনিকতত্ত্বের শিরোণাম হিসেবে ব্যবহার না করেও অনেকে অস্তিত্ববাদী বলে অভিহিত হয়েছেন। প্রাচ্যের দার্শনিক চিন্তার প্রধান ক্ষেত্রই হচ্ছে মানুষ। মানবকল্যাণের দর্শন বা মানবতাবাদী দর্শনই প্রাচ্যে প্রাধান্য পেয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১খ্রি.) প্রাচ্যের এক মহান চিন্তাবিদ। তাঁর বিপুল পরিমান সাহিত্যকর্মের মধ্যদিয়ে তিনি মানুষ সম্পর্কিত বা মানবজীবনের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার একটি দিকে আমরা তাঁর মধ্যে অস্তিত্ববাদী মতাদর্শের সন্ধান পাই। তবে তাঁর অস্তিত্ববাদ পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদ থেকে অনেকটা আলাদা প্রকৃতির। এই মতবাদকে নান্দনিক অস্তিত্ববাদ নাম দেওয়া যায়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে একজন মৌলিক অস্তিত্ববাদী চিন্তাবিদ এবং তাঁর অস্তিত্ববাদ যে পাশ্চাত্যের অস্তিত্ববাদ থেকে অনেক দিক দিয়ে আলাদা তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে; এবং তাঁর এই অস্তিত্ববাদের নাম দেয়া হয়েছে নান্দনিক অস্তিত্ববাদ।

পাশ্চাত্য দর্শনে অস্তিত্ববাদ (existentialism) নামক যে দার্শনিকতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে তার সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কেননা অস্তিত্ববাদ বিংশ শতাব্দিতে, বিশেষকরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অত্যন্ত প্রভাবশালী দার্শনিক ভাবনারূপে প্রকাশিত ও পরিগণিত হলেও এর প্রধান প্রকাশ মাধ্যম ছিলো সাহিত্য। প্রখ্যাত ডাচ দার্শনিক

---

* ড. মো. শওকত হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সোরেন কিয়ার্কেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫) অস্তিত্ববাদের সূচনাকারী বলে স্বীকৃত হলেও এ মতাদর্শ জনপ্রীতি লাভ করে জার্মান দার্শনিক নীট্‌শে, হাইডেগার এবং ফরাসী দার্শনিক জ্যা. পল. সার্ত ও আলজেরীয়ান দার্শনিক আলবেয়ার ক্যামু প্রমুখের লেখনির মাধ্যমে। এঁদের সকলের লেখার মধ্যে ছিলো অসাধারণ সাহিত্যিক গুণ। বিশেষকরে, শেষোক্ত দু'জন সরাসরি সাহিত্যিক। সার্ত সাহিত্য সাধনা করেছেন তাঁর দার্শনিকভাবনা, বিশেষকরে, অস্তিত্ববাদী ভাবনাকে সহজ সরলভাবে প্রকাশ করার জন্য। অন্যদিকে, আলবেয়র ক্যামু নিজেকে অস্তিত্ববাদী হিসেবে পরিচয় দিতে কিছুটা দ্বিধা করলেও তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে অস্তিত্ববাদ ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে— একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

এভাবে অস্তিত্ববাদ নামটি ব্যবহার করে হোক আর এ পরিচয় না নিয়েই হোক অনেক সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ রয়েছেন যাঁদের ভাবনায় অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূলমন্ত্র গৃহিত হয়েছে। অনেক সাহিত্যিক ও নন্দনতাত্ত্বিক আছেন যাঁদের চিন্তা অস্তিত্ববাদকে ধারণ করেছে বা তাঁরা এক নতুন ধরনের অস্তিত্ববাদী মত প্রদান করেছেন যা অস্তিত্ববাদের মূলসুরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এমন একজন সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.)। তিনি নিজেকে অস্তিত্ববাদী হিসেবে পরিচয় না দিলেও বা অস্তিত্ববাদী দর্শনের সাথে একাগ্রতা প্রকাশ করে কোন বক্তব্য না দিলেও তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, কবিতা, সঙ্গীত, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি শিল্পকর্মের মধ্যদিয়ে এক বিশেষ ধরনের অস্তিত্ববাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই অস্তিত্ববাদকে নাম দেওয়া যায় *নান্দনিক অস্তিত্ববাদ* (aesthetic existentialism)।

নান্দনিক অস্তিত্ববাদ বলতে আমরা এমন এক অস্তিত্ববাদকে বুঝাতে চাচ্ছি যা নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে অস্তিত্ববাদে উপনীত হয়। নান্দনিক দৃষ্টিকোণ বলতে সৌন্দর্যবোধ, শিল্পবোধ এবং রসবোধ বা রুচিবোধকে বুঝানো হচ্ছে। বিশেষকরে, এই তিন বোধকে কাজে লাগিয়ে যদি কোন অস্তিত্ববাদে পৌঁছানো যায় তাহলে তাকে নান্দনিক অস্তিত্ববাদ বলা চলে।

যাইহোক, নান্দনিক দৃষ্টিকোণ বলতে আমরা যা বুঝাতে চাই তা অনেকটা এই যে, জগত ও জীবনকে সৌন্দর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা, জগতের ও জীবনের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা; কেবল সৌন্দর্য উপলব্ধি নয় সৌন্দর্য সৃজন করা, রস সৃষ্টি করা এবং জীবনকে ও জগতকে উপভোগ করার ক্ষেত্রে বিশেষ রুচিবোধ কাজে লাগানো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবন ও জগতকে এমন নান্দনিকবোধ দ্বারা, নান্দনিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। এবং তাঁর মাধ্যমে তিনি এক বিশেষ অস্তিত্ববাদী মতের প্রবর্তন করেছেন বলা চলে। তাঁর এই বিশেষ অস্তিত্ববাদ বুঝতে হলে 'অস্তিত্ববাদ' বলতে দর্শনে কোন্ ধরনের তত্ত্বকে বুঝানো হয়— সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদের মধ্যে নানারকম মতের সংযোগ ঘটেছে। বিভিন্ন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক একে বিভিন্ন রকম করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ.পল সার্ত একে একটি

সাধারণ বৈশিষ্ট্যের আওতায় আনতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, এটি হলো সেই মতবাদ যে মতবাদ মনে করে— 'অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্বগামী'।[১] সার্ত-এর এই কথার মাধ্যমে অস্তিত্ববাদকে বুঝার পূর্বে আরও কিছু বিষয় বুঝা আবশ্যক তা হলো, অস্তিত্ববাদ মানবজীবন সংক্রান্ত তত্ত্ব — অর্থাৎ জীবনদর্শন। মানুষের জীবনের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়েই এই মতবাদ আলোকপাত করে। এবং এই মানুষ মূলত ব্যক্তিমানুষ (individual person)। ব্যক্তিমানুষের বিকাশ নিয়ে এই মতবাদ আলোকপাত করে। তাই ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বকে তার সারধর্মের পূর্বগামী হিসেবে ভাবা বা গ্রহণ করাকেই অস্তিত্ববাদ বলা হয়।

"অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্বগামী"— এই সূত্রের মাধ্যমে অস্তিত্ববাদকে বুঝতে হলে প্রথমেই 'অস্তিত্ব' এবং 'সারধর্ম' বলতে অস্তিত্ববাদে কী বুঝানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রচলিত অর্থে অস্তিত্ব শব্দটি বলতে 'অবস্থান করা' বা 'থাকা' বুঝানো হয়। যেমন, যদি বলা হয়, কোন বিশেষ শহরে এক কোটি মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে, তখন এর দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সময়কালে এক কোটি মানুষের ঐ শহরে জীবন্ত অবস্থান করাকে বুঝানো হয়। সুন্দরবনে বাঘের অস্তিত্ব আছে— এর দ্বারা সুন্দরবনে বাঘ থাকাকে বুঝায়। কিন্তু অস্তিত্ববাদী দর্শনে 'অস্তিত্ব' শব্দটি শুধুমাত্র বিষেশভাবে সচেতন এবং সক্রিয় ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে বেঁচে থাকা এবং অস্তিত্বশীল হওয়াও এক কথা নয়। অস্তিত্ববাদী দর্শনে অস্তিত্ব একটি ক্রিয়া অথবা একটি ক্রিয়াশীল অবস্থা যা কেবল মানুষই লাভ করতে পারে। তাই এখানে অস্তিত্ব শব্দটি একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মতে ক্রিয়াশীল অবস্থাটি হচ্ছে 'হয়ে ওঠা', কোন একটি অপূর্ণাঙ্গ অবস্থান থেকে পূর্ণতার দিকে, নতুন কিছু হয়ে উঠতে সচেষ্ট হওয়া। অস্তিত্ববাদীদের মতে, মানুষ সর্বদা একটি অপূর্ণ সত্তা। তবে সে অসম্ভব সম্ভাবনাময় জীব এবং তার রয়েছে আত্মোপলব্ধির ক্ষমতা। এই ক্ষমতা ব্যবহার করে সে যদি স্বাধীনভাবে নিজের অবস্থার উন্নতি করতে চায় বা নিজেকে আরো উচ্চতর অবস্থানে নিয়ে যেতে চায়— তবেই সে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে।

সাধারণভাবে সারধর্ম বা সারসত্তা বলতে কোন বস্তু বা বিষয়ের আবশ্যিক গুণ বা গুণাবলীকে বুঝায়। এখানে সারসত্তা যেন সুনির্ধারিত কিছু। কিন্তু অস্তিত্ববাদে সারসত্তা বলতে মূলত মানুষের সম্ভাবনামূলক এক আপেক্ষিক পূর্ণতাকে বুঝানো হয়। ভাববাদী দার্শনিকগণ সারধর্ম বা সারসত্তা সম্পর্কে একধরনের সামান্যবাদের প্রচার করেছেন এবং বিশেষ বিশেষ বস্তু বা বিষয়কে তাঁরা ঐ সার্বিক সারসত্তার অধীন বলেও চিহ্নিত করেছেন। এক্ষেত্রে সার্বিক সত্তাকে বিশেষ বিষয়ের পূর্বগামী এবং প্রত্যেক বিশেষ বিষয়ের ভিত্তি বলে তাঁরা মনে করে থাকেন।

অস্তিত্ববাদীদের মতে, কোন সার্বিক স্থায়ী সারসত্তা বলে কিছু নেই। তবে মানুষের রয়েছে অনেক কিছু হয়ে ওঠার মতো সম্ভাবনা। মানুষের ঐ সম্ভাবনাময় পূর্ণতাকেই তার সারসত্তা বা সারধর্ম বলা চলে। অস্তিত্বের প্রক্রিয়ায় মানুষ তা লাভ করার চেষ্টা করে।

তাঁদের মতে, প্রথমে অস্তিত্ব তার পরে সারসত্তা। তাঁরা দেকার্তের 'আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি অস্তিত্বশীল' উক্তিটিও যথার্থ বলে গ্রহণ করেন না। তাঁরা মনে করেন যে, আমাদের অস্তিত্ব আছে বলেই আমরা চিন্তা করতে পারি। কিয়ার্কেগার্দ বলেন, "কেবলমাত্র চিন্তাশীল সত্তা হিসেবেই মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে এমনটি বলা ভুল; অর্থাৎ চিন্তাশীল হওয়া মানে অস্তিত্বশীল হওয়া নয়। যে চিন্তাশীল সে চিন্তারত থাকতে পারে কিন্তু যে অস্তিত্বশীল সে নিজের অস্তিত্বকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করতে ব্যস্ত— কথাটি প্রত্যেক মানবসত্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য"।[২] তাই অস্তিত্ববাদ অনুসারে মানুষ নিজেই তার সারসত্তার রূপকার। মানুষের সারসত্তা কখনও নির্ধারিত নয়। মানুষ তাঁর আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-অতিক্রমণের ক্রিয়ার ফলে সে যদি তাঁর সকল সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তুলতে পারে তবে সেভাবেই তাঁর স্বরূপধর্ম প্রকাশিত হবে। সার্ত বলেন : "অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্বগামী বলতে আমরা কী বুঝি? এর দ্বারা আমরা বুঝাতে চাই, মানুষের অস্তিত্ব আছে। এটাই প্রথম কথা। তারপর সে নিজেই নিজের সম্মুখীন হয়, আপন পছন্দ অনুযায়ী জগতকে গতিশীল করতে তৎপর হয়, এবং পরিশেষে নিজেই নিজের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করে।"[৩] তিনি আরো বলেন: "যেহেতু মানুষের পূর্ব নির্ধারিত কোন রূপ নেই, সুতরাং তার কর্মময় জীবনে সে নিজেই নিজের সারধর্ম অর্জন করে।"[৪] অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষ তার কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা সারধর্ম অর্জন করে।

অস্তিত্ববাদ এভাবে মানুষের সম্ভাবনাময় অবস্থাকে বিকশিত করার উৎসাহ প্রদান করে এবং এই সম্ভাবনাসমূহের দিকে নিজেকে উন্নীত করার মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা নিহীত বলে অস্তিত্ববাদীরা বিশ্বাস করেন। তবে এই আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-অতিক্রমের ক্ষেত্রে মানুষকে অস্তিত্ববাদীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে মনে করেন। অস্তিত্ববাদে স্বাধীনতার ধারণা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। একথা বলা যায় যে, 'অস্তিত্ব হচ্ছে অস্তিত্ববাদের বিষয়বস্তু, আত্মিকতা হলো এর পদ্ধতি এবং স্বাধীনতা হলো এর পরিচালক।'[৫]

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা অস্তিত্ববাদের প্রকৃতি ও তার মূল কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছি। এ পর্যায়ে আমরা দেখতে চেষ্টা করবো এই বৈশিষ্ট্যগুলো রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিদ্যমান কিনা। কেননা যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে কাউকে অস্তিত্ববাদী বলা চলে তা যদি কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তাহলে তাকেও অস্তিত্ববাদী বলা যেতে পারে।

প্রথমেই অস্তিত্ববাদের মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অস্তিত্বকে সারসত্তার পূর্বগামী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় স্থান পেয়েছে কিনা তা দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, মানুষের সম্পূর্ণ রূপ বা সারসত্তা তার মধ্যে জন্মগতভাবে অবস্থান করে না। তার পূর্ণরূপ কখনও তার মধ্যে থাকে না; বরং এই রূপের দিকে তাকে অগ্রসর হতে হয়। সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষকে অর্জন করে নিতে হয় তাঁর জীবনের অনেক সম্ভাবনাকে। এভাবেই সে ছুটে চলে পূর্ণতার দিকে। আর এই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হবার জন্য তার

দরকার নিজেকে জানা। শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই তার এই বোধ জন্মে এবং সেই অনুযায়ী সে নিজেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> মানুষ আপনাকে ও আপনার পরিবেষ্টন বাছাই করে নেয়নি। সে তার প'ড়ে যাওয়া ধন। কিন্তু সংগে আছে মানুষের মন; সে এতে খুশি হয় না। সে চায় মনের মতোকে। মানুষ আপনাকে পেয়েছে আপনিই, কিন্তু মনের মতোকে অনেক সাধনায় বানিয়ে নিতে হয়। এই তার মনের মতোর ধারাকে দেশে দেশে মানুষ নানা রূপ দিয়ে বহন করে এসেছে। নিজের স্বভাবদণ্ড পাওয়ার চেয়ে এর মূল্য তার কাছে অনেক বেশী। সে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি; তাই আপনার সৃষ্টিতে আপনার সম্পূর্ণতা বরাবর সে অর্জন করে নিজেকে পূর্ণ করেছে। সাহিত্যে শিল্পে এই যে তার মনের মতো রূপ এরই মূর্তি নিয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে সে আপনার সম্পূর্ণ সত্য দেখতে পায়— আপনাকে চেনে।[৬]

রবীন্দ্রনাথ এখানে স্পষ্টই বলেছেন যে, মানুষের জন্মগত অবস্থান তার সারসত্তা বা প্রকৃত পূর্ণরূপের তুলনায় অনেক অপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। মানুষ তার সৃজনীশক্তি নান্দনিকবোধ দ্বারা নিজেকে বুঝতে পারে এবং তার মনের মতো করে নিজেকে সৃজন করে চলে। এভাবে সে যে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় তা-ই তাকে প্রকৃত সারসত্তার দিকে নিয়ে যায়। তাঁর একথা অস্তিত্ববাদের মূলসূত্র "অস্তিত্ব সারসত্তার পূর্বগামী"-এর সাথে মিলে যায়। আর এ ক্ষেত্রে মানুষ যেহেতু তার সৃজনীশক্তি তথা নান্দনিক বোধকে কাজে লাগায় সেহেতু এই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথকে নান্দনিক অস্তিত্ববাদী বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ আরও দেখান যে, শিল্পচর্চা এবং সাহিত্য সৃজনের মাধ্যমে মানুষ তার আত্মশক্তির বিকাশ বা প্রকাশ ঘটায়।[৭] তাই সাহিত্য বা শিল্প সৃজনকে তিনি আত্মবিকাশ বা অস্তিত্ববাদী অর্থে আত্ম-অতিক্রমের পথ বলে মনে করেন। মানুষের অন্তরাত্মা নান্দনিক বোধের দ্বারা নিজেকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাঁর মতে, সৌন্দর্যচেতনা বা নান্দনিক চেতনার দ্বারা মানুষ অসীমের সন্ধান পায়। নিজেকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সে তখন আর আবদ্ধ করে রাখে না; বরং তার ঠিকানা সে তখন খুঁজে পায় অসীমের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বলেন: "... সৌন্দর্যকে আমরা বাহিরে দেখি— তাহাতে চোখ জুড়ায়, কিন্তু তাহাকে অন্তরে গ্রহণ করি না। ... কিন্তু সৌন্দর্য অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে সেদিন তাহার মধ্য হইতে অসীম একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।"[৮]

অস্তিত্ববাদীদের মতো রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, মানুষ অসীম সম্ভাবনাময় সত্তা। মানুষের মধ্যে ঐশ্বর্য আছে। তবে সকলেই ঐশ্বর্যের খবর রাখে না; তাই সকল মানুষই আত্মপ্রকাশ তথা আত্ম-অতিক্রম করতে পারে না। যারা আত্মপ্রকাশ করতে পারে তারাই আত্ম-অতিক্রম করে ক্ষণকালের সত্তা হয়েও অসীম অনন্তকালে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে। যারা এটা পারে না তাদেরকে রবীন্দ্রনাথ মনের দিক থেকে দরিদ্র বলে অভিহিত করেছেন।[৯] রবীন্দ্রনাথ দেখান যে, মানুষের জন্মের পর থেকেই তার সত্তার

বিকাশ ঘটে ক্রমশ। এই বিশ্বচরাচরে তার আগমন অনেক সম্ভাবনার বার্তা বহন করে; জন্ম থেকেই সে একদিকে ব্যক্তিমানুষ ও অন্যদিকে বিশ্বজনীন মানুষ হয়ে অসীমের সাথে একাত্ম হবার সম্ভাবনা নিয়ে আসে। মানুষ ক্রমশ বড় হয়ে নিজেকে নতুন নতুনভাবে সৃজিত করে চলবে বলে রবীন্দ্রনাথ আশা করেন। মানুষ সকল অন্ধকার ও অশুভ বাধা জয় করে নিজেকে উৎকৃষ্ট সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে সচেষ্ট হবে। এজন্য মানুষকে তিনি প্রতিক্ষণেই নতুন হতে বলেছেন। অর্থাৎ পুরাতনকে আকড়ে ধরে নিজের অবস্থানকে নিয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না করে অসীমের পানে নিবেদন করার প্রতি তিনি উৎসাহ দেন। তিনি তাই বলেন :

হে নতুন
দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ॥
তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়।[১০]

মানুষের অসীম সম্ভাবনা ও ক্ষমতা, সীমিত সত্তা হয়েও অসীমের পানে নিজেকে নিবেদিত করা— এর শক্তি মানুষ পেল কোথায়? অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মধ্যে মানুষের এই চেতনা ও ক্ষমতার উৎস নিয়ে মতভেদ আছে। আস্তিক অস্তিত্ববাদীরা মনে করেন যে, এই ক্ষমতা ঈশ্বরপ্রদত্ত, মানুষ তা অগ্রায়ন ও চর্চা করে থাকে। অন্যদিকে, নাস্তিক অস্তিত্ববাদীরা এই ক্ষমতাকে নিছক প্রকৃতিগত বলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে আস্তিক্যবাদী মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, মানুষের এই ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদান করেছেন। ঈশ্বরই মানুষকে নান্দনিক বোধ দিয়েছেন। এই বোধের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রদত্ত অসীস সম্ভাবনার দিকে মানুষকে অগ্রসর হতে হবে। আর এই অগ্রসর হতে হলে মানুষকে বিধাতা বা ব্রহ্মের সৃজনিকর্ম তথা শৈল্পিকতাকে অনুকরণ করতে হবে। বিধাতা বা ব্রহ্ম সৃজন করেন আনন্দের সাথে। এই আনন্দ এক ধরনের নিষ্কাম নির্মল আনন্দ, এটা এক ধরনের লীলাময় স্বার্থহীন আনন্দ। মানুষকে সত্যিকার অর্থে সৃজনশীল হয়ে নিজেকে বিকশিত করতে হলে বৈষয়িক স্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে সরে এসে কেবল নির্মল ও নির্মোহ আনন্দ অভিসারে নিজেকে সপে দিতে হবে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তিনি বলেন :

> ভগবানের আনন্দ সৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত; মানব হৃদয়ের আনন্দ সৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎ সৃষ্টির আনন্দগীতের ঝংকার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে; সেই যে মানবসংগীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে

> আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ।[১১]

রবীন্দ্রনাথের মতে, বিধাতা লীলাময়। তিনি সৃজনের মাধ্যমে আনন্দ পেতে চান।[১২] মানুষকে সৃজনশীল হতে হবে তাই এই লীলাময় আনন্দ পাবার জন্য। আর এই লীলাময়ের জাগতিক সৃজন লীলাকে তিনি তাই আনন্দ যজ্ঞ বলেছেন। এই আনন্দ যজ্ঞে মানুষকেও অংশ নিতে হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন: "জগতের আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।/ ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন॥"[১৩]

পূর্বেই বলেছি যে, সৃজনকর্ম বা লীলা, এমনকি, জগত ও জীবনকে নান্দনিকভাবে বুঝে নিজের ক্ষমতার সন্ধান লাভ এবং নান্দনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজেকে অসীমের দিকে নিয়ে যাওয়া তথা পূর্ণতার দিকে সারসত্তার দিকে নিয়ে যাওয়ার শক্তি বিধাতাই মানুষকে দিয়েছেন বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাই তিনি বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করেন যে, তিনি যেন এই নান্দনিক অনুভূতি ও আত্ম-অতিক্রমের ক্ষমতা আরও বেশি করে আমাদের দান করেন। তিনি এই ক্ষমতাকে কখনও কখনও 'আলো' বলেও মনে করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভূবন-ভরা,
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা॥
নাচে আলো নাচে, ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে।
বাজে আলো বাজে, ও ভাই, হৃদয় বিনার মাঝে।
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা॥[১৪]

যে আলোতে বা শক্তিতে জগতের সবকিছু জেগে ওঠে— বিকশিত হয়, সেই আলোতেই মানবসত্তা জেগে ওঠে— বিকশিত হয়। এ আলো বিধাতার অনন্ত সত্তা থেকে আসে। বিধাতার নিকট তাই আলোর দ্বার খুলতে আকুতি জানান রবীন্দ্রনাথ এভাবে:

আলোকের পথে, প্রভূ, দাও দ্বার খুলে—
আলোক-পিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে,
... .
নিখিল ভূবনে যারা আত্মহারা
আঁধারের আবরনে খোঁজে ধ্রুবতারা,
তাহাদের দৃষ্টি আনো রূপের জগতে—
আলোকের পথে॥[১৫]

এই আলোরূপ ঐশরিক শক্তি বিধাতা যাকে দেন তার জীবন নান্দনিক হয়ে ওঠে। আঁধারের মাঝে সে পথ খুঁজে পায়। এবং তার জীবন পূর্ণতার দিকে ছুটে চলে।

রবীন্দ্রনাথ তাই নিজের জন্য আরো বেশি করে বিধাতার এই আলোকরূপী শক্তি প্রাপ্তির প্রার্থনা করেন। তিনি একে প্রাণশক্তি বলেও চিহ্নিত করেন। যেমন তিনি বলেন :

প্রাণ ভরিয়ে, তৃষ্ণা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে, তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান॥
আরো আলো, আরো আলো
এই নয়নে, প্রভূ ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পুরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান॥
আরো বেদনা, আরো বেদনা,
প্রভূ দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে, বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ।
আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক্ নেমে।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান॥[১৬]

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, বিধাতার ঐ "আলো" মানুষ যখন লাভ করে তখন সে বিধাতার সাথে নিজেকে মিলনের পথও রচনা করতে পারে। নিজের আমিত্বকে ঘুচিয়ে অনন্তের মধ্যে নিজেকে সপে দিতে পারে। তাঁর মতে, এভাবেই আসে মানবজীবনের পূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথের এই মতের সাথে আস্তিক অস্তিত্ববাদী এবং অস্তিত্ববাদের প্রতিষ্ঠাতা বলে খ্যাত সোরেন কিয়ার্কেগার্দের মতের মিল লক্ষ করা যায়। কেননা কিয়ার্কেগার্দও ঈশ্বেরের সাথে মিলনকে মানবজীবনের পরম সার্থকতা বলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ ও কিয়ার্কেগার্দ উভয়ই এখানে মরমীবাদী মতের ধারক।

যাইহোক, মানুষ আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে নিজেকে জেনে-বুঝে, নিজের ক্ষমতা-যোগ্যতাকে অনুধাবন করে যখন নিজেকে অসীমের দিকে পরিচালিত করে তখন সে বৈষয়িক অনেক প্রয়োজনের গণ্ডি থেকে নিজেকে মুক্ত করে আরও উচ্চতর স্তরে নিজেকে উত্তীর্ণ করার জন্য কাজ করে। এই অবস্থাই তার আত্ম-অতিক্রমের অবস্থা। নিজের আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তির বাইরে যেয়ে প্রয়োজনের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নান্দনিকভাবে জীবনকে পরিচালিত করার মাধ্যমেই মানুষ উচ্চতর স্তরে নিজেকে উন্নীত করতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। প্রয়োজনের বাইরেও নিজেকে নিবদ্ধ করার মধ্যেই প্রকৃত পূর্ণতা আসে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন যে, বিধাতার অসীম সৃজনী কর্মের বিশালতা অনুভব করে তাঁরই অনুকরণে এবং অনুগ্রহে

নিজেকে এই প্রয়োজনের জগত থেকে ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। তিনি বলেন:

তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে
মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন্ ক্ষণে॥
....
দিনে মোর যা প্রয়োজন বেড়াই তারি খোঁজ করে,
মেটে বা নাই মেটে তা ভাবব না আর তার তরে।
সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে
এসেছি সকল চাওয়ার বাহির দেশে,
নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে
প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে
তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে॥[১৭]

মানুষের সৌন্দর্যচেতনা বা নান্দনিকবোধই তাকে প্রয়োজনের সীমানার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। মানবাত্মাকে যথার্থভাবে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে হলে তাকে নান্দনিকবোধের ধারক হতে হয়। নান্দনিক বোধসম্পন্ন আত্মাই প্রকৃত মানবাত্মা বা অস্তিত্বশীল মানবাত্মা বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তিনি বলেন : “ঘটি-বাটির উপযোগিতা মানুষের প্রয়োজনের পরিচয় মাত্র কিন্তু তার সৌন্দর্যে মানুষের নিজেরই রুচির, নিজেরই আনন্দের পরিচয়। ঘটি-বাটির উপযোগিতা বলছে, মানুষের দায় আছে, ঘটি-বাটির সৌন্দর্য বলছে, মানুষের আত্মা আছে।”[১৮] এই “আত্মা আছে” বিষয়টিকেই আমরা অস্তিত্ববাদী অর্থে বলতে পারি “অস্তিত্ব আছে”। অর্থাৎ অস্তিত্ববাদীরা যে অর্থে মানুষকে অস্তিত্বশীল বলতে চান সেই অর্থে এই প্রয়োজনের গণ্ডির বাইরে নান্দনিক অনুভূতি ও সৃজনিচেতনাযুক্ত আত্মা প্রকৃত অস্তিত্বশীলতার বাহক। এই আত্মার প্রয়োজনেই মানুষ সৃজন করে, নিজেকে বিকশিত করে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সৃজনশীল মানুষই প্রকৃত বিকশিত মানুষ। তাঁর চিন্তায় আত্ম-অতিক্রমের পথ হলো সৃজনের পথ। মানুষের প্রকৃত পরিচয় নির্ভর করে সে কতটা সৃজনশীল হয়ে ওঠে তার ওপর, এভাবেই মানুষের সারসত্তা আবিষ্কার করা চলে। নিজের বৈষয়িক প্রয়োজনকেই মুখ্য করে নয়; বরং নিজের আত্মশক্তি, নান্দনিকবোধ তথা সৃজনীশক্তিকে বিকশিত করার জন্য যে সৃজনকর্ম রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন যথার্থ সৃজন। এই সৃজন মানুষকে উচ্চতর মানবিক জীবন দান করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন : “মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে, মানুষ সৃষ্টিকর্তা। আজকের দিনের সভ্যতা মানুষকে মজুর করেছে, মিস্ত্রি করেছে, মহাজন করেছে, লোভ দেখিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে খাটো করে দিচ্ছে। মানুষ নির্মাণ করে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়।”[১৯]

রবীন্দ্রনাথের মতে, সৃজনি প্রতিভাবান মননশীল মানুষ চীরসবুজ— সদা যৌবনা, তাদের তারুণ্য কখনও লোভ পায় না। তরুণরা যেমন উদ্যোগী ঠিক সৃজনশীল মানুষ

বৃদ্ধ হলেও সে তার মধ্যে তারুণ্যকে সতেজতাকে ধারণ করতে পারেন। *সবুজের অভিযান* নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন:

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।[২০]

যাদের মধ্যে স্থবিরতা এসেছে, যারা নিজেকে বিকশিত করার বদলে সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রেখেছেন— তারা প্রকৃতপক্ষে জীবনের যথার্থ প্রগতির পথে (অস্তিত্ববাদী অর্থে অস্তিত্বের পথে) চলমান নয়। এদের অবস্থা বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ, এদেরকেও জাগিয়ে তুলতে বলেছেন তাঁর *সবুজের অভিযান* কবিতায়। তাঁর ভাষায়:

খাঁচা খানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়;
আর তো কিছু নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ওই- যে প্রবীণ, ওই-যে পরম পাকা—
চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বদ্ধ-করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।[২১]

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা বেঁচে থাকা আর অস্তিত্বশীল হওয়াকে এক করে দেখেননি। যারা আত্মসচেতন নয় এবং আত্ম-অতিক্রমের চেষ্টাও করে না তারা জীবন্ত হলেও প্রকৃত অস্তিত্ববাদী অর্থে অস্তিত্বশীল নয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে এ ধরনের মানুষকে প্রকৃত 'জীবন্ত' মানুষও বলতে চাননি। তাঁর মতে, যে ধরনের মানুষ আত্মসচেতন নয়, জীবনের বহুমুখি কাজে নিয়োজিত নয়, জীবনের পথে প্রগতিশীল নয়, জীবনকে উন্নত করার জন্যে সদা জাগ্রত এবং প্রচেষ্টারত নয় তারা যথার্থ অর্থে জীবন্ত নয়। বলা চলে জ্যান্ত মরা। এ ধরনের মানুষকে জাগিয়ে তোলার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অস্তিত্ববাদ কেবল মানুষেরই অসীম সম্ভাবনার কথা বলে। সার্ত প্রমুখের মতে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অপূর্ণ সত্তা (pour-soi)। অন্যদিকে, কোন বস্তু বা অন্য কোন প্রাণি স্বয়ং পূর্ণ সত্তা (en-soi)। মানুষ স্বয়ং অপূর্ণ এ জন্য যে, মানুষের রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। সে অনেক কিছু হয়ে উঠতে পারে। তার বর্তমান অবস্থা তাই তার অসীম সম্ভাবনার কাছে কিছুই না। এ অর্থে সার্ত বলেন:

> ... man first of all exists, encounters himself, surges up in the world— and defines himself afterwards. If man as the existentialist sees him is not definable, it is because to begin

> with he is nothing. He will not be anything until later, and them he will be what he makes of himself.[২২]

অন্যদিকে জড় বা অন্য প্রাণির কোন কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। এদের আত্মবিকাশের সম্ভাবনা নেই। তাই এরা স্বয়ং পূর্ণ সত্তা (en-soi)। এরা যা তাই-ই। মানুষের আত্মবিকাশের সুযোগ এবং সম্ভাবনা আছে বিধায় মানুষকে তাই অন্যান্য জীব ও জড় সত্তা থেকে পৃথক করা চলে। রবীন্দ্রনাথ অস্তিত্ববাদী এই মূলনীতিও ধারণ করেছেন। তিনি মানুষের সাথে অন্য প্রাণির পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, মানুষ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য, বিকশিত করার জন্য কেবল নিজের প্রয়োজনীয় কিছু অন্বেষণের বাইরেও কাজ করে। এই কাজ করার জন্য সে নিজেকে এক সীমিত গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর জগতে বা স্তরে নিজেকে নিয়ে যায়। যারা এমনভাবে নিজেকে গণ্ডির বাইরে নিয়ে যায় তারাই শিল্প সৃজন করে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন।[২৩] রবীন্দ্রনাথ দেখান যে, শিল্প সৃজনের মূল লক্ষ হলো ব্যক্তিত্বের বিকাশ বা প্রকাশ ঘটানো (the expression of personality)।[২৪] এতে করে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ মানুষের শিল্প সৃজনের দিক থেকে তথা নান্দনিক দিক থেকেই নিজেকে বিকশিত করা তথা অস্তিত্বের প্রক্রিয়ায় (অস্তিত্ববাদী বিশেষ অর্থে) নিয়ে যেতে চান। এদিক থেকেও তাই রবীন্দ্রনাথকে নান্দনিক অস্তিত্ববাদী বলা চলে।

আমরা জানি, অস্তিত্ববাদী দর্শনে স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ স্বাধীনতার পক্ষে এত জোর দিয়েছেন যে, তারা এমনটিও বলেন যে, মানুষ হওয়া আর স্বাধীন হওয়া এক কথা। মানুষ অপরিহার্যরূপে স্বাধীন। রবীন্দ্রনাথও মানুষকে স্বাধীন সত্তারূপে চিহ্নিত করেন। বাহ্যিক জীবনে মানুষের যতই বাধা থাকুক না কেন মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অন্তত মানুষ স্বাধীন— অস্তিত্ববাদীদের এ ধরনের মতের সাথে রবীন্দ্রনাথের ধারণায় একাত্মতা লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক লেখায় এই মনস্তাত্ত্বিক স্বাধীনতার কথা বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন: "কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে।"[২৫] অন্যত্র তিনি বলেছেন :

> মন মোর মেঘের সঙ্গী,
> উড়ে চলে দিগ্‌দিগন্তের পানে
> নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণবর্ষণ সঙ্গীতে
> রিমিঝিম রিমিঝিম রিমিঝিম॥[২৬]

রবীন্দ্রনাথ শিল্পের মাধ্যমে বা শিল্প সৃজনের মাধ্যমে এক ধরনের স্বাধীনতা উপভোগের কথা বলেছেন— যে স্বাধীনতা কেবলমাত্র সৃজনশীল মানুষই অর্জন করতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণি এটা অর্জন করতে পারে না। কেননা অন্য প্রাণি প্রবৃত্তির তাড়নায় কাজ করে। তাই তারা প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষ প্রবৃত্তির বাইরে এসেও কেবল লীলা হিসেবে অনেক কাজ করে থাকে। সৃজনশীল কাজ অনেক ক্ষেত্রেই

লীলাময়। এই কাজ বৈষয়িক প্রয়োজনের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। মানুষ তার মনের তাড়নায় কেবল সৃজনের নিমিত্তেই সৃজন করে। এটি এক ধরনের নিষ্কামকর্ম। কেউ তাকে এ কাজ করতে বাধ্য করে না; আবার কোন বস্তুজাগতিক বাধ্যবাধকতা বা দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদেও সে এটা করে না। তাই মানুষের এ ধরনের লীলাময় সৃজনকর্ম মানুষের স্বাধীনতার ধারক। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, নিজের অবস্থাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে যা অন্য কোন জীব পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> ... of all living creatures in the world, man has his vital and mental energy vastly in excess of his need, which urges him to work in various lines of creation for its own sake... art reveals man's wealth of life, which seeks its freedom in forms of perfection which are an end in themselves.[২৭]

সাধারণ অস্তিত্ববাদী দর্শনের স্বাধীনতার ধারণার সাথে রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতার ধারণার কিছুটা পার্থক্য এখানে লক্ষণীয়। সাধারণভাবে পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদীরা মানুষের স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করেছেন যে কোন কাজ করার ক্ষেত্রে বা যে কোন কিছু হয়ে ওঠার বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ মূলত আলোকপাত করতে চান সৃজনশীল কর্মের ওপর। মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা তিনি সৃজনশীল কর্ম বা লীলাময় কর্মের মধ্যেই পরিপূর্ণ বা সার্থকভাবে দেখতে পান। মানুষের নান্দনিক চেতনাই তাকে স্বাধীনতার স্বাদ অনুধাবন করায় বলে তিনি মনে করেন। আর একারণেই রবীন্দ্রনাথকে নান্দনিক অস্তিত্ববাদী বলা চলে। তবে রবীন্দ্রনাথের এই নান্দনিক অস্তিত্ববাদের সাথে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট-এর ধারণার কিছু মিল লক্ষ করা যায়। কান্ট শিল্পীর কল্পনার স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে খেলার সাথে বিষয়টি তুলনা করেছেন। একে তিনি "free play" বলেছেন।[২৮] এই খেলা এক ধরনের স্বাধীন খেলা যা আমাদের কল্পনাকে ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে। রবীন্দ্রনাথের লীলাবাদ ঠিক এ অর্থে খেলাবাদ না হলেও তা অনেকটা কান্টের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলা চলে। সে যাইহোক, এই লীলা একটি স্বাধীন ক্রিয়ার দিকে মানুষকে পরিচালিত করে। ব্যক্তিস্বাধীনতা দ্বারাই এই লীলা সংঘটিত হয়ে থাকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অস্তিত্ববাদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো আত্মিকতা (subjectivity)। ব্যক্তিমানুষ তার আত্মোপলব্ধির দ্বারা নিজের সম্ভাবনা তথা সত্তার অপ্রাপ্ত দিকগুলো অর্জনের নিমিত্তে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হয়, আত্ম-অতিক্রমের চেষ্টায় রত হয়। এই সামগ্রিক অস্তিত্বের প্রক্রিয়ায় মানুষ একাকি অগ্রসর হয়। অন্য মানুষ তাকে যতই সাহায্য করুক না কেন প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের সম্ভাবনাকে যদি নিজেই বিকশিত না করে তাহলে সে যথার্থভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে না বলেই অস্তিত্ববাদীরা মনে করেন। আত্মোপলব্ধি, আত্মমূল্যায়ন, জগৎকে ব্যাখ্যা এবং তাকে নিজের ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয়টি অস্তিত্ববাদীদের নিকট একান্তই ব্যক্তিক। আত্মগততা (subjectivity)-ই ইচ্ছে

অস্তিত্ববাদী মূল্যায়ণ বা দৃষ্টিভঙ্গির একটি মূল কথা। তবে এক্ষেত্রে আত্মগততা বা আত্মকেন্দ্রিকতা সম্পর্কিত পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী মতের একটু বিশেষণ করা আবশ্যক। পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী দর্শনের শ্রেষ্ঠতম পুরোধা সার্ত অস্তিত্ববাদী আত্মগততাকে দু'টি বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি একে যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করেছেন, তেমনি তিনি এটাও দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা মত দিতে যেহেতু স্বাধীন, তাই এক্ষেত্রে একক সত্তার প্রাধান্যই এখানে প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, তিনি এটাও দেখিয়েছেন যে, মানুষ তার আত্মগত অভিরুচির বা আত্মগততার বাইরে যেতে পারে না। সার্ত-এর ভাষায়:

> The word “subjectivism” is to be understood in two senses, and our adversaries play upon only one of them, Subjectivism means, on the one hand, the freedom of the individual subject and, on the other, that man cannot pass beyond human subjectivity. It is the latter which is the deeper meaning of existentialism.[২৯]

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়ও আত্মগত দৃষ্টিকোণ পরিলক্ষিত হয়। তিনি স্বীয় মনের রং-এর আলোকেই জগতের সবকিছুকে মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। যেমন তিনি তাঁর *আমি* কবিতায় বলেছেন:

আমারই চেতনার রঙ্গে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম ‘সুন্দর’—
সুন্দর হল সে।[৩০]

রবীন্দ্রনাথ এখানে আত্মগত অভিমতকেই বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, সৌন্দর্য উপলব্ধি, সৃজন এবং রুচির ব্যাপারে মানুষের আত্মগত মতেরই প্রাধান্য। কর্তার মনই এখানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ব্যক্তিমানুষের আত্মগত অনুভূতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন তার আত্মবিকাশ বা প্রকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে। সৃজনের দিক থেকে ব্যক্তি তার স্বকীয় অনুভূতি মূল্যায়ন, স্বনির্ধারণ দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ বা বিকাশ নিশ্চিত করে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিধাতার প্রকাশের দিকটিও তুলে ধরেছেন। বিধাতা, তাঁর মতে, সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজনকর্তা; তিনি সৃজন করেন তাঁর সার্বভৌম পরম স্বকীয়তা দ্বারা। বিধাতা পরমভাবে স্বকীয়তার ধারক। ব্যক্তিমানুষও যদি সার্থক সৃজন কর্তা হতে চায়— বিকাশ ঘটাতে চায় নিজেকে তাহলে স্বকীয় ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিকশিত হতে হবে বলে

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাঁর মতে, জগতের সৃজনসমূহ পরমস্রষ্টা অথবা ব্যক্তিমানুষের আত্মগত প্রচেষ্টারই ফল। এই প্রচেষ্টা বন্ধ হলে, স্তব্ধ হয়ে যাবে জগত-প্রক্রিয়া; এমনকি সৌন্দর্য, প্রেম ইত্যাদিও বিলুপ্ত হবে। রবীন্দ্রনাথ *আমি* কবিতার শেষের দিকে বলেন :

> সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
> নীলিমাহীন আকাশে
> ব্যক্তিত্বহীন অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
> তখন বিরাট বিশ্বভূবনে,
> দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
> এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনখানেই—
> 'তুমি সুন্দর'
> 'আমি ভালোবাসি'।[৩১]

রবীন্দ্রনাথের মতে, "ব্যক্তিত্বহীন অস্তিত্বের" কোন মূল্য নেই। এটা শুধু সংখ্যা বাড়াতে পারে কিন্তু এর কোন সক্রিয়তা নেই, নেই বিকাশ তথা নতুন কিছু হয়ে ওঠা ও সৃজনশীলতা। সুন্দরকে মূল্যায়ন করা ও ভালোবাসাও এর দ্বারা সম্ভব নয়। তাই বুঝা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এই "ব্যক্তিত্বহীন অস্তিত্ব"কে প্রকৃত অস্তিত্ব বলতে চাননি। অস্তিত্ববাদী দর্শনেও এই একই ভাবধারা লক্ষণীয়। তবে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ব্যক্তিমানুষের আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, রুচি ও উদ্যোগের গুরুত্বকে বিধাতার পরম ব্যক্তিত্বের সাথে এবং তাঁর সৃজনি ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করেছেন তার তুলনায় বা অনুরূপ মতাদর্শ পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদে লক্ষ করা যায় না। পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী দর্শনের সূচনাকারী সোরেন কিয়ার্কেগার্দ মানুষের ব্যক্তিত্বের বা অস্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনে ঈশ্বরের নির্দেশনা অনুসরণ তথা ধার্মিক হবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রক্রিয়া হিসেবে ঈশ্বরের বিকশিত হবার প্রক্রিয়ার সাথে ব্যক্তিমানুষের বিকাশকে সম্পর্কিত করেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিমানুষকে বিকশিত হবার ক্ষেত্রে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের বিকশিত হবার প্রক্রিয়াকে অনুসরণ বা অনুকরণ করতে বলেছেন।

> উপনিষদ্ ব্রহ্মাস্বরূপের তিনটি ভাগ করেছে– সত্যম্ জ্ঞানম্ এবং অনন্তম্। চিরন্তনের এই তিনটি স্বরূপকে আশ্রয় করে মানব-আত্মারও নিশ্চয় তিনটি রূপ আছে। তার একটি হল আমরা আছি, আর একটি হল আমরা জানি; আর একটি কথা তার সঙ্গে আছে,...। সেটি হচ্ছে আমরা ব্যক্ত করি। ইংরেজিতে বলতে গেলে বলা যায়– I am, I know, I express...। 'আমি আছি' এটি হচ্ছে ব্রহ্মের সত্য স্বরূপের অন্তর্গত, 'আমি জানি' এটি ব্রহ্মের জ্ঞান স্বরূপের অন্তর্গত, 'আমি প্রকাশ করি' এটি ব্রহ্মের অনন্ত-স্বরূপের অন্তর্গত।[৩২]

উপনিষদের এই তিনটি বিষয়ের প্রথমটি অর্থাৎ "আমি আছি"— মানুষের আত্মগত বিষয়টি নির্দেশ করে যা অস্তিত্বের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয়। "আমি জানি"—

বিষয়টি আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। তবে "আমি প্রকাশ করি"— বিষয়টি একটি অনন্ত প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়ার শেষ নেই। মানুষকে এই প্রক্রিয়ায় নিজের ব্যক্তিসত্তাকে অগ্রসরমান করাতে হয়। বিধাতার প্রকাশ যেমন শাশ্বত, তেমনি মানুষের প্রকাশকেও হতে হবে অনির্দেশ্য— রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রকাশের এই ধারা অনন্তের পথে যাত্রা স্বরূপ।

অস্তিত্ববাদী দর্শনের আত্মিকতা বা আত্মবাদিতা অনেক সমালোচনার শিকার হয়েছে। অনেকে এই মতবাদকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে চিহ্নিত করতে চান। তাঁদের মতে, এই দর্শনে ব্যক্তিগত রুচি, ব্যক্তির নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থ অর্থাৎ তার আত্মবিকাশের জন্য তথা আত্ম-অতিক্রমনের জন্য ব্যক্তির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে— সামাজিক প্রয়োজন তথা সার্বিক মানুষের কল্যাণের কথা ভাবা হয়নি। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ অবশ্য এ ধরনের সমালোচনা যথার্থ বলে স্বীকার করেন না। সার্ত প্রমুখ অস্তিত্ববাদীরা বরং আস্তিত্ববাদকে যথার্থ এক ধরনের মানবতাবাদ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সার্ত দেখান যে, ব্যক্তিমানুষ নিজে যখন কোন কিছু নির্মাণ করে তার মধ্যদিয়ে সে মূলত সর্বজনীনভাবে মানুষের কোন বিষয়কে নির্বাচনের প্রতিই সমর্থন জ্ঞাপন করে। তিনি বলেন :

> When we say that man chooses himself, we do mean that every one of us must choose himself; but by that we also mean that in choosing for himself he chooses for all men.[৩৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মবিকাশের প্রয়োজনে ব্যক্তিমানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিলেও সামাজিক মানুষের স্বার্থের সাথে তাকে কখনও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে তিনি দেখেননি। তিনি মানুষের সামাজিক সত্তার প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তির বিকাশের স্বার্থে এমনকি ব্যক্তির বিকাশের অন্যতম শর্ত হিসেবেও তিনি সামাজিক কল্যাণকে বা ব্যক্তির সামাজিক কর্মকাণ্ডকে গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তির বিকাশের প্রয়োজনেই অন্যের সাথে ঐক্যবোধের দরকার হয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। এবং অন্যের জন্য নিজেকে নিবেদনের মধ্যে তিনি আত্মপ্রকাশের সার্থকতা দেখতে পান। এমন সামাজিকভাবে বিকশিত জীবনকে তিনি 'মহাজীবন' বলেও অভিহিত করেন।

> অন্যের সাথে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য, সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানা প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে একলা মানুষ সেখানে আর প্রকাশ নেই। টিকে থাকার অসীমতা-বোধকে অর্থাৎ, 'আপনার থাকা অন্যের থাকার মধ্যে'— এই অনুভূতিকে মানুষ নিজেরই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনিক ব্যাহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে না। তখন সেই মহাজীবনের প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার সেবায় ত্যাগে সে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মহাজীবনের

> আনন্দকে আবেগকে সে নানা সাহিত্যে স্থাপত্যে মূর্তিতে চিত্রে গানে প্রকাশ করতে থাকে।[৩৪]

পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদ থেকে অনেকটা ভিন্ন অর্থেও রবীন্দ্রনাথ সামাজিক কল্যাণের ধারণাটিকে ব্যক্তির বিকাশের সাথে সম্পর্কিত ও সমন্বিত করেন। তাঁর এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি মূলত নন্দনতাত্ত্বিক। মানুষ যখন স্রষ্টা, মানুষ যখন সৌন্দর্যপ্রেমিক, মানুষ যখন নির্মল আনন্দ সৃজন ও উপলব্ধিকারক তখন সে নিজেকে নিজের মধ্যে অথবা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ রাখে না; মানুষ তখন নিজেকে ছড়িয়ে দেয়, নিজের বৈষয়িক প্রয়োজন ভুলে যায়, এমনকি মানুষ নিজের জীবনও বিলিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সৃষ্টি" নামক প্রবন্ধে বলেন:

> কোন্‌খানে মানুষের শেষ কথা। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ প্রকৃতির তথ্যরাজ্যের সীমা অতিক্রম করে আত্মার চরম সম্বন্ধে নিয়ে যায়; যা সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, কল্যাণের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ; তারই মধ্যে। সেইখানেই মানুষের সৃষ্টির রাজ্য। সেখানে প্রত্যেক মানুষ আপন অসীম গৌরব লাভ করে, সেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্য সকল মানুষের তপস্যা। ... রস সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ আপন পূর্ণতাকে উৎসর্গ করে দিয়েই পূর্ণতার ঐশ্বর্য লাভ করে। সেই ঐশ্বর্য কেবল তার সাহিত্যে ললিত-কলায় নয়, তার আত্মবিষর্জনের লীলাভূমি সমাজে নানা সৃষ্টিতেই প্রকাশ পায়। সেই সৃষ্টির মূল্য জীবনযাত্রার উপযোগিতার নয়, মানবাত্মার পূর্ণস্বরূপের বিকাশে— তা অহৈতুক, তা আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত।[৩৫]

এখানে স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ আত্মবিকাশের কথা, ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ প্রকাশের কথা বললেও ব্যক্তির সামাজিক সত্তাকে অবজ্ঞা করেননি; বরং সামাজিকভাবে প্রকাশের মধ্য দিয়ে সর্বসাধারনের কল্যাণে নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে বিলিয়ে দেবার মধ্য দিয়েই তিনি ব্যাক্তিমানুষের পূর্ণতার কথা বলেছেন। ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনভাবে বিকাশের কথা স্বীকার করলেও এবং এক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদীদের মতো গুরুত্ব প্রদান করলেও তিনি দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তি কখনও সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্তি, স্বাধীনতা এবং পূর্ণাঙ্গতা অর্জন বা ভোগ করতে পারে না। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন: "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়॥/ অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়/ লভিব মুক্তির সাধ!"[৩৬]

পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী দর্শনে শূন্যতার ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সোরেন কিয়ার্কেগার্দ থেকে শুরু করে প্রায় সকল অস্তিত্ববাদী দার্শনিকই মানুষের মধ্যে শূন্যতাকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। কিয়ার্কেগার্দ এই শূন্যতাকে এক ধরনের 'ভীতি' (dread) বলে চিহ্নিত করেন। অস্তিত্বের প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজের মধ্যে এক বিশাল শূন্যতা উপলব্ধি করে। সে লক্ষ করে যে তার অপরিসীম সম্ভাবনার নিকট তার বর্তমান অবস্থা খুবই নগণ্য। এতেকরে আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ তার মধ্যে এই শূন্যতা লক্ষ করে উদ্বেলিত

হয়ে ওঠে। অনেক কিছু না হতে পারা, বা হতে পারবে কিনা তার জন্য এক ধরনের ভীতি আত্মসচেতন মানুষকে অনেক ক্ষেত্রেই ভীত এবং বেদনাবিধুর করে তোলে বলে কিয়ার্কেগার্দ প্রমুখ অস্তিত্ববাদীরা মনে করেন। তাঁদের মতে, এই ভীতি, উদ্বেগ বা বেদনা অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠার জন্য বা আত্ম-অতিক্রম করার নিমিত্তে একান্তভাবে জরুরিও। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এধরনের ভাবনা লক্ষ করা যায়। তিনি শিল্প সৃজনের ক্ষেত্রে এধরনের শূন্যতাবোধ, ভীতি উদ্বেগ ও বেদনার কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, শিল্প সৃজনের বোধ যখন মানুষের আসে, মানুষ তখন নিজেকে বা নিজের সেই বোধ প্রকাশের জন্য ব্যকুল থাকেন; আবার তা প্রকাশ করার জন্য এক ধরনের দায়বদ্ধতাও শিল্পীর মনে থাকে; সঠিকভাবে তা প্রকাশ না করা পর্যন্ত থাকে এক ধরনের বেদনা— তবে, রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রকাশ করার মধ্যে রয়েছে এক নির্মল আনন্দ। তিনি এই আনন্দকে অলৌকিক আনন্দ বলেও অভিহিত করেন। যেমন তিনি *ভাষা ও ছন্দ* কবিতায় বলেছেন :

—অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
উর্ধ্বশিখা জালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।[৩৭]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ববাদী ভাবনা এক ধরনের নন্দনতাত্ত্বিক অস্তিত্বাবাদী ভাবনা। অস্তিত্বের প্রক্রিয়ায় মানুষ যে শূন্যতা, ভীতি, উদ্বেগ বা বেদনা অতিবাহিত করে তাও তাই নান্দনিক অর্থেই বিবেচনা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মতে, শিল্পী শিল্প সৃষ্টির প্রারম্ভে এই শূন্যতাজনিত ভীতি, উদ্বেগ, বেদনা অনুভব করে থাকেন। কবি বাল্মীকি'র উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেষ্টা করেন যে, তিনি যখন *রামায়ন* রচনার চেষ্টা করেন তখন তার এই বেদনা ছিলো মূলত প্রকাশ করার বা সৃজন করার বেদনা। এই উদ্বেগ-বেদনা রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন এভাবে:

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়,
মহানন্দ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দূর্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মুল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল
তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধুর্জটির প্রায়; সেইমত বনানীয় ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্‌বেগভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি, রক্তবেগতরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্তিয়া মুখে

নব ছন্দ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত,[৩৮]

অস্তিত্ববাদী দর্শনে শূন্যতার ধারণা কেবল বেদনা সৃষ্টি করে তা নয়, এটা এক ধরনের চঞ্চলতা এনে দেয়— কোন কিছু করার, কোন কিছু হয়ে ওঠার জন্য সদা ব্যকুল করে তোলে এই শূন্যতার চেতনা। অস্তিত্ববাদে বর্ণিত এই ধরনের চঞ্চলতা রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়ও পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই শূন্যতা ও চঞ্চলতাকে সদর্থক নঞর্থক উভয় অর্থেই ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি ইতিবাচক দিকটির প্রতিই অর্থাৎ প্রগতির দিকেই বেশি জোর দিয়েছেন। নতুন কিছু হয়ে ওঠার দিকেই এই চঞ্চলতাকে প্রবাহিত করতে চেয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ॥
হাসি কান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ॥
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ ॥[৩৯]

রবীন্দ্রনাথ এখানে স্পষ্টতই জন্ম-মৃত্যু তথা “being” এবং “nothingness”-এর কথা যেমন বলেছেন, তেমনি ভালো-মন্দ তথা কল্যাণ-অকল্যাণ বা শুভ অশুভরের কথা বলেছেন। আবার হাসি-কান্না তথা সুখ-দুঃখের কথা বলেছেন। তবে সার্বিকভাবে তিনি এসকল তরঙ্গকেই সামনে চলার প্রেরণা হিসেবে দেখেছেন।

প্রায় সকল পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী একথা স্বীকার করেছেন যে, মানুষের পূর্ণতা কখনও অর্জিত হয় না। পূর্ণতার পথে মানুষের অনন্ত অভিসার চলে। মানুষ এই প্রক্রিয়ায় তার সারসত্তাকে আবিষ্কার করে চলে। তবে কখনই এই প্রক্রিয়া শেষ হয় না। প্রকৃত অস্তিত্বশীল মানুষ সর্বদা নিজেকে শূন্য বা অভাবী মনে করেন। তাকে অনেক কিছুই হয়ে উঠতে হবে, কিন্তু সেই তুলনায় সে যেন তেমন কিছুই নয়। তাই অনেক কিছু হয়ে ওঠার তৃষ্ণায় সে কাতর হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এমন তৃষ্ণার কথাও ব্যক্ত হয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন: “চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে/ আমি বৃষ্টিবিহিন বৈশাখী দিন, সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।[৪০]

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা অস্তিত্ববাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে তার সাথে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার অন্বয় খোঁজার চেষ্টা করেছি। আমরা লক্ষ করেছি যে, অস্তিত্ববাদের মূল বিষয়গুলো বা মূলভাবধারার অধিকাংশ দিকের সাথেই রবীন্দ্রভাবনার সাদৃশ্য আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অস্তিত্ববাদীদের সকলের সাথে একেবারে সবদিক থেকেই সাদৃশ্যপূর্ণ তা নয়। অস্তিত্ববাদী হওয়ার জন্য এটি প্রয়োজনীয়ও নয়। এমনকি পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী বলে যারা পরিচিত তাঁদের চিন্তার মধ্যেও রয়েছে বিস্তর বৈসাদৃশ্য।

আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অস্তিত্ববাদী চিন্তা ও চেতনায় মৌলিকত্বের ধারক। পাশ্চাত্য কোন অস্তিত্ববাদের অনুকরণ এমনকি তার কোন প্রভাবে তিনি এমনটি মত পোষণ করেছেন তা নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে অস্তিত্ববাদের মূল সূত্র: 'অস্তিত্ব সারসত্তার পূর্বগামী'— এ ধরনের ভাবধারা রবীন্দ্রনাথ পোষণ করলেও তাঁর এই চিন্তার ধরন তাঁর নিজস্ব। তিনি মানুষকে সদা অপূর্ণ ভাবতে বলেছেন এবং অস্তিত্বের প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়ে পূর্ণতার দিকে চালিত হবার প্রেরণা দিয়েছেন এবং নিজে সেই প্রেরণায় নিজের জীবনকেও উদ্ভুদ্ধ করেছেন। তিনি শূন্যতার কথা বলেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদের মত শূন্যতাকে কেবল ভীতিকর (dread) বলে চিহ্নিত করেননি। তিনি তাঁর মধ্যকার স্বাধীনচেতা আত্ম-অতিক্রমনের প্রেরণাকে "জীবনদেবতা" বলেও মনে করেছেন। তাঁর এই জীবনদেবতার ধারণা একান্তই মৌলিক। "জীবনদেবতা" তাঁর স্বীয় সত্তার মধ্যে অনুভূত অস্তিত্বের শক্তি বা আত্ম-অতিক্রমনের প্রেরণা। এই প্রেরণাসূচক "জীবনদেবতা" তাঁর নিজের মধ্যে সৌন্দর্য রূপে অনুভূত হয়।[৪১] একারণে তাঁকে নান্দনিক অস্তিত্ববাদী বলা যায়। তিনি অবশ্য এই সৌন্দর্যের উৎস হিসেবে তথা আত্ম-অতিক্রমের প্রেরণা হিসেবে চূড়ান্তভাবে পরমসত্তা বা পরমসুন্দর বিধাতার বা ব্রহ্মের ধারণায় উপনীত হয়েছেন। এদিক থেকে তিনি মরমীবাদী। পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রাথমিক উদ্যোক্তা বা জনক সোরেন কিয়ার্কেগার্দও এক ধরনের মরমীবাদে উপনীত হয়েছিলেন। তবে তাঁর মরমীবাদ ব্যাপকভাবে খ্রিস্টধর্ম আশ্রিত; রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কিয়ার্কেগার্দের চিন্তার সাথে ব্যাপকভাবে পৃথক— যদিও উভয় চিন্তা অস্তিত্ববাদী ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী বলে যারা পরিচিত তাদের অনেকের লেখায় ব্যাপক হতাশা বা উদ্বিগ্নতা (anguish) প্রকাশ পেয়েছে। সার্ত এই উদ্বিগ্নতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, অস্তিত্ববাদীরা একথা প্রাথমিকভাবে স্বীকার করে নেয় যে, 'মানুষ মূলত উদ্বিগ্নতার মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন : "... it is very simple. First, what do we man by anguish? The existentialist frankly states that man is in anguish."[৪২] অস্তিত্ববাদের প্রাথমিক উদ্যোক্তা বলে খ্যাত কিয়ার্কেগার্দও 'the anguish of Abraham' নামক এক ধরনের উদ্বিগ্নতার কথা উল্লেখ করেছিলেন।[৪৩] আলবেয়র ক্যামুর লেখায় উদ্বিগ্নতার প্রকাশ পেয়েছে ব্যাপকভাবে। তিনি মানবজীবনকে সার্বিকভাবেই চরম

অনিশ্চয়তার ধারক বলে চিহ্নিত করেছেন, তিনি এমন মতও প্রকাশ করেছেন যে, নিরন্তর দুর্দশার শিকার মানবজীবনে বেঁচে থাকাটাই মূলত অস্বাভাবিক। তিনি এক ধরনের অনিশ্চয়তাবাদ প্রচার করেছেন যা *absurdism* বলে পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি তাঁর *The Myth of Sisyphus*-এ যে মত প্রকাশ করেছেন তা নিতান্তই হতাশাবাদ। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় দুঃখ-দুর্দশা জাগতিক অকল্যাণ সকলই স্থান পেয়েছে। সময় ও সভ্যতার বিবর্তনে মানুষ, বিশেষকরে, ব্যক্তিমানুষ যে নানা বিষয়ে উদ্বিঘ্ন হতে পারে এ বিষয়গুলোও স্থান পেয়েছে তাঁর বিভিন্ন লেখায়। কিন্তু সার্বিকভাবে তিনি জীবনকে মানব অস্তিত্বকে দুর্শশাগ্রহ ও সর্বগ্রাসী অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত বলে মনে করেননি। বরং মানুষকে এ সবকিছু তার অস্তিত্বের প্রক্রিয়ায় আত্ম-অতিক্রমের চেতনায় জয় করে জীবনকে কল্যাণের দিকে সৌন্দর্যের দিকে আনন্দের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা ॥[৪৪]

তথ্যসূত্র :

১. Jean-Paul Sartre, *Existentialism and Humanism*, Translation and Introduction by Philip Mairet, Eyre Methuen Ltd. London, 1973, p. 26

২. Soren Kierkegaard, *Concluding Unscientific Postscript*, Priniceton University Press, 1946. P- 206

৩. Jean-Paul Sartre, *op. cit.* P. 28

৪. Jean-Paul Sartre, *Being And Nothingness, trans by Hazel, E. Barnes* : New York, 1966. P. 772

৫. নীরু কুমার চাক্মা, *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩৩

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য, শিল্প, প্রবাসী*, আষাঢ়, ১৩৪৮ (বাংলা), ১৯৪১ (ইংরেজি)

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য, শিল্প, প্রবাসী*, আষাঢ়, ১৩৪৮ (বাংলা), ১৯৪১ (ইংরেজি)

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আনন্দরূপ*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ (বাংলা), ১৯১২ (ইংরেজি)

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য, বঙ্গবানী*, বৈশাখ ১৩৩১ (বাংলা), ১৯২৪ (ইংরেজি)

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান*-৫৫, দেখুনঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতাবিতান*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ. ৪৭৩

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্যের তাৎপর্য*, বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ন ১৩১০ (বাংলা), ১৯০৩ (ইংরেজি), দেখুনঃ সাহিত্যচিন্তা, পৃ. ১৫৯

১২. দেখুনঃ *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ২১২

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, ৭৬

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, *প্রগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ৩০৫

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ৪৭৩

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতলেখা*-৩, *স্বরবিতান*-৩৯, *গীতচর্চা*-২ দেখুন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ২৭-২৮

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ৬

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাপানযাত্রা*-১, ১৯১৬ (ইং), দেখুনঃ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : শিল্পচিন্তা, সম্পাদনা সত্যেন্দ্রসাথ রায় গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৩৪

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সৃষ্টি*, বঙ্গবানী, কার্তিক ১৩৩১, ইং ১৯২৪

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সবুজের অভিযান*, *বলাকা*, দেখুনঃ সঞ্চয়িতা, পৃ. ৩৪৪

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সবুজের অভিযান*, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ৩৪৫

২২. Jean-Paul Sartre, *op. cit.* P. 28

২৩. *Rabindranath Tagore, What is Art, Reasonality, 1917,* দেখুনঃ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : শিল্পচিন্তা, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ১৩৬

২৪. Rabindranath Tagore, *Loc. cit.*

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আনন্দবাজার*, শারদীয়া, ১৩৪৮

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান* ৫৩, দেখুন : *গীতবিতান*, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ২৫৮

২৭. Rabindranath Tagore, *The Religion of an Artist-1*, দেখুনঃ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : শিল্পচিন্তা, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ২২১

২৮. Immanuel Kant, *The Critique of Judgement,* transleted by: James Creed Meredith, Oxford University Press, London, 1982 (reprinted), p. 227

২৯. Jean-Paul Sartre, *Existentialism and Humanism*, Translation and Introduction by Philip Mairet, Eyre Methuen Ltd. London, 1973, p. 29

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আমি*, *শ্যামলী*, দেখুনঃ সঞ্চয়িতা, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ৪৬৮

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '*আমি*', *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ৪৬৯

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য*, বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১, ইং ১৯২৪

৩৩. Jean-Paul Sartre, *op. cit.* p. 29

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য*, বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩১, ইং ১৯২৪

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সৃষ্টি*, *বঙ্গবানী*, কার্তিক ১৩৩১ (বাংলা), ১৯২৪ ইং

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মুক্তি*, দেখুন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা*, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ২৭৭

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভাষা ও ছন্দ*, ভারতী, ভাদ্র-১৩০৫, ইং ১৮৯৮

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভাষা ও ছন্দ*, *প্রাগুক্ত*

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতিলিপি-৫*, *গীতিচর্চা*-১ দেখুন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ২৯৫

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চন্ডালিকা*, দেখুন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতিবিতান*, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ২৩৮

৪১. দেখুনঃ ড. ক্ষুদিরাম দাস, *রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়*, মলিক ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৭৮

৪২. Jean-Paul Sartre, *op. cit.* p. 30

৪৩. *Ibid*, p. 31

৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *দুঃসময়*, *কল্পনা*, দেখুনঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চায়িতা, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ১৮০

Abstract : Rabindranath Tagore (1861-1941) is a polymath having career with great contributions especially in the field of literature. His prolific writings in almost every main sectors of literature are to be treated as great job evaluating it's quantity and quality. In many of his writings Rabindranath has expressed some philosophical conceptions from which we can imply that he is actually an existentialist in his humanitarian thought which is in many ways, comparable to that of western existentialism, a big philosophical movement in post Hegelian western philosophy, which is, like Tagore, mainly expressed through literature. But the existentialism of Rabindranath Tegore is not something imitated from that of western existentialism; rather he has maintained some special ways with his own view point without sharing any conception of western thinkers and that is why his existentialism is to be treated as a especial type of existentialism which can be named as aesthetic existentialism. In this article there has been an endeavor, at first, to show that Rabindranath Tagore is an existentialist and secondly an initiative has been taken to show the logic in favor of treating Tagore's existentialism as aesthetic existentialism.